কালের দর্পণে

বাংলা প্রবন্ধ

ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

কালের দর্পণে বাংলা প্রবন্ধ

প্রকাশক :
সাহিত্য সঙ্গী
৬ডি, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট (দ্বিতল)
কলকাতা-৭০০০০৯

গ্রন্থস্বত্ব : তনিকা রায়চৌধুরী

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর, ২০১৫

প্রচ্ছদ : কৌশিক মজুমদার

মুদ্রণ :
সুমিতা প্রিন্টার্স
১১০/১সি. রাজা রামমোহন সরণী
কলকাতা-৭০০০০৯

ISBN : 978-93-82045-41-0

প্রাপ্তিস্থান :
দে'জ পাবলিশিং, দে বুক স্টোর, উষা পাবলিশিং হাউস, বিশ্বাস বুক স্টল, প্রেসিডেন্সি বুক স্টল, প্রজ্ঞা বিকাশ (কলকাতা), ছাত্র ভাণ্ডার (সাঁইথিয়া), পুরুলিয়া বুক এজেন্সি, ভ্রাতৃ সংঘ (বাঁকুড়া), আসানসোল পুস্তকালয়, ঐশ্বর্য্য (কাটোয়া), পুঁথিপত্র (আরামবাগ), শ্যামসুন্দর পুস্তকালয় (কামারপুকুর) নলেজ হোম (বাঁকুড়া), এ. কে. ডি. (পুরুলিয়া), তুহিনা (বাঁকুড়া), ল্লিক পুস্তকালয় (মেদিনীপুর), নিউ বুক স্টল (মহিষাদল), বুক সেন্টার (বহরমপুর), ভূর্জপত্র (মেদিনীপুর), এডুকেশন্যাল এম্পোরিয়াম, নবদ্বীপ, বুক কর্ণার, গ্রন্থ বিচিত্রা (বহরমপুর), নিউ শিক্ষা নিকেতন (বহরমপুর), বুকহাউস, উমা বুক স্টোস (কাঁদি, বহরমপুর), বইঘর (কৃষ্ণনগর), লোকনাথ বুক হাউস (ময়নাগুড়ি), কিশলয় (বর্ধমান), ছাত্র মহল (করিমপুর), The Bengal Paper Trading Co. (Murshidabad), Advance (C.St.),

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা (১৫০.০০)

সূচীপত্র

- প্রাচীন কাব্য মেঘদূত ঃ কবির সৌন্দর্যদৃষ্টির পরিপূর্ণতা ১
- বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল কাব্যে সামাজিক শ্রেণীদ্বন্দ্ব ঃ প্রতিবাদী স্বরূপ ১১
- মঙ্গলকাব্য গঠনের সূত্রসন্ধান ঃ ধনপতির আখ্যান ২৪
- অন্নদামঙ্গল পুনর্বিচার ঃ নাট্যলক্ষণ এবং অন্যান্য ৪৩
- তিনসঙ্গী ঃ ব্যক্তিত্বময়ী নারীর অনুসন্ধান ৬০
- 'ব্যথার দান' ও আত্মমুখী নজরুল ৭৯
- প্রেমেন্দ্র মিত্রের ছোটগল্প ঃ মনস্তাত্ত্বিক বিচার ৯০
- মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে যৌনচেতনা ১১০
- নকশালবাদী আন্দোলনের জোয়ার-ভাটায় বাংলা সাহিত্য ১২৯
- ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে উত্তর চব্বিশ-পরগণার গাজন ১৪৪
- বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালি জনমানস ১৫১
- সুন্দরবনের জনজীবন ও বনবিবি ১৬০

ক্ষেত্রসমীক্ষার আলোকে
উত্তর-চব্বিশ পরগণার গাজন

ভারতীয় সভ্যতার উন্মেষ কাল থেকে দেবাদিদেব রূপে শিবের স্থান সুনির্দিষ্ট। বিশাল ভারতের প্রতিটি প্রান্তে, জনপদে, অরণ্যে, প্রান্তরে শিব সর্বত্র বিরাজমান। তাঁর সদাপ্রসন্ন আশীর্বাদে ভারতবাসী নিতাই অভিষিক্ত। আবার পাশাপাশি এও দেখা গেছে, যখনই শিব মর্ত্য পৃথিবীর প্রতি প্রসন্নবিমুখ হয়েছেন তখন অনিবার্যভাবে এসেছে প্রলয়। অন্যান্য দেবতাগণ সকলে একজোট হয়েও সেই প্রলয়কারী উন্মাদগ্রস্ত দেবতার ক্রোধকে নিমেষে প্রশমন করতে পারেননি। সতীর দেহত্যাগের পর শিবের ক্রোধের স্বরূপ কারও অজানা নয়। আবার প্রসন্নচিত্ত শিবের অপার মহিমার দ্বারাই দেবী অন্নপূর্ণার পুণ্য প্রতিষ্ঠা এবং সরস-বেগবতী গঙ্গার আগমন ঘটেছে এই ধরণীতে। মানুষ বা অন্যান্য প্রাণীকুলের প্রধান দুই উপাদান খাদ্য ও জল সৃষ্টি করে, শিব সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই জনপ্রিয়।

প্রসঙ্গত বলে রাখা ভালো যে আমাদের লক্ষ্য সারা ভারতবর্ষ-ব্যাপী শিবের মাহাত্ম্য বা কীর্তিবর্ণনা নয়, কেবলমাত্র বাংলার লোকজীবনে পালিত শৈববিশ্বাসের একটি বিক্ষিপ্ত প্রতিফলনকে তুলে ধরাই বর্তমান নিবন্ধের মূল বিষয়। আশা করি এর দ্বারা দুটি কার্য সম্পন্ন হবে—

ক) শৈব বিশ্বাসের সর্বত্র সঞ্চারিত রস হিল্লোলে বাংলার লোকবিশ্বাসের একটি ক্ষীণ ধারা যুক্ত হয়ে পাঠক চিত্তে শৈব রসোদ্‌গতির উদ্রেক বৃদ্ধি করবে।

খ) শিবের মহিমা জ্ঞাপক পূজা প্রচারে একটি নির্দিষ্ট রূপের সন্ধান, প্রচলিত ক্রমবর্ধমান লোকসাহিত্যের ক্ষেত্রসীমাকে সামান্য পুষ্টিদানে সহায়তা করবে।

শিবমাহাত্ম্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদির মধ্যে চড়ক বা গাজনের উৎসব বাংলার নিজস্ব সম্পদ। এর মধ্য দিয়ে একাধারে বাংলার সমাজ, সংস্কার, প্রকৃতি, পরিবার, আচার, ব্যবহার, ধর্ম, বিশ্বাস, স্থান কাল, পাত্র ইত্যাদি সমস্ত কিছুর প্রতিচ্ছবি খুঁজে পাওয়া সম্ভব। উপরন্তু আধুনিক মননশীল কাব্যভাবনার পরীক্ষামূলক প্রয়োগ পদ্ধতির আত্মপ্রকাশের পাশে বাংলার লোক কবিগণের ছড়া কাটানো সহজ রীতির অভ্যন্তরে সুবিস্তৃত বাস্তব প্রেক্ষাপটটি যথারীতি আশ্চর্যের। মোট কথা সবদিক মিলিয়ে বাংলার চড়ক বা গাজনের উৎসব কেবল আকর্ষণীয় নয়, শিক্ষণীয়ও বটে।

বাংলার প্রায় সব রাজ্যেই চৈত্রমাসের বিভিন্ন সময় ভিন্ন ভিন্ন রীতি পদ্ধতিতে গাজন বা চড়কের উৎসব পালিত হয়। উৎসব উপলক্ষে কেউ কেউ শিবের সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানটি মোটামুটি তিন-চার দিন পালিত হলেও কোথাও কোথাও সারা মাস ব্যাপী অনুষ্ঠান পালিত হয়। তবে মূল অনুষ্ঠান হয় একমাত্র চৈত্র সংক্রান্তির দিন। গাজনে অংশ গ্রহণকারী সন্ন্যাসীগণ আনুষ্ঠানিক দিনগুলিতে শিবের অসম্ভব শক্তি ও অপার কৃপাকে স্মরণ করে বিভিন্ন প্রকার গূঢ়তর ক্রিয়া প্রদর্শন করেন। কাঁটাবিদ্ধ হয়ে চড়কগাছে পাক খাওয়া থেকে শুরু করে, ঝাঁপবাণ, পার্শ্ববাণ, কপালবাণ, আগুননাচ, মাথা চালা, মানিকবেড়, দণ্ডডাক, বেতভাঙা, আগুনঝাঁপ কাঁটাঝাঁপ প্রভৃতি বিপজ্জনক

খেলা দেখানোর মূল উদ্দেশ্য প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাস কেন্দ্রিক, যা বাংলার লোকসমাজের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। সর্বত্রই এই সন্ন্যাসীগণ আনুষ্ঠানিক দিনগুলিতে গৃহ-পরিবার সংসর্গহীন হয়ে শিবের মতোই সর্বহারা, ছন্নছাড়া জীবনাচার পালন করে। চৈত্রমাসের প্রখর গরমে বাংলার বিভিন্ন গ্রামগুলিতে পালিত অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণকারী সন্ন্যাসীদের ধুলোমাখা শরীর, স্বল্পবস্ত্র পরিধান দেখে সততই বাবার চেলা বা শিষ্য বলে মনে হয়। তারা সকলে মিলে একত্র বা বিক্ষিপ্ত ভাবে গ্রামের একপ্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত খালি পায়ে যাতায়া করে। সঙ সাজে, শিবের মহিমা কীর্তন প্রচার করে। এ সময় কোনো সন্ন্যাসী মাছ-মাংস ভক্ষণ করে না, তারা ফলমূল বা একবেলা ভাত খেয়ে ভোলানাথ শিবের মতই রিক্ত নিঃস্ব ভাবে দিন কাটায়। একেবারে অনুষ্ঠানের শেষদিনে ফুল-বেলপাতা, নৃত্য-বাদ্য সহযোগে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে শিবপূজা সমাপন করে সন্ন্যাস ব্রত ভঙ্গ করে।

মোটামুটি বাংলার অধিকাংশ গ্রামাঞ্চলেই এই পদ্ধতিতে চড়ক বা গাজনের উৎসব পালিত হয়। তবে পূজাপ্রচার ও ব্রত সংকল্পের ভিত্তিতে গ্রামে গ্রামে অনুষ্ঠিত সন্ন্যাস ধর্মের মধ্যে কিছু পার্থক্যও লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে মূলত তিন প্রকার সন্ন্যাসী প্রধান—কাঁটা সন্ন্যাসী, আগুন সন্ন্যাসী এবং খেঁজুর সন্ন্যাসী। হুগলি নদীর পাশ্ববর্তী উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার গ্রামগুলিতে উক্ত তিনপ্রকার সন্ন্যাসীরই প্রচলন মেলে। তবে বর্তমান কালে ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে কাঁটা সন্ন্যাসী বা আগুন সন্ন্যাসীর তুলনায় হাবড়া, বনগাঁ, মছলন্দপুরের অধিকাংশ গ্রামে খেঁজুর সন্ন্যাসীর পরিমাণ বেশি। এর কারণ বোধ হয় কুসংস্কার ও দৈববিশ্বাসের ওপর ক্রমশ আধুনিকতার আস্ফালন। তথাপি বাংলার অন্যান্য জেলায় প্রচলিত চড়কের অনুষ্ঠানাদির সঙ্গে মিলিয়ে এখনও এ অঞ্চলের মানুষজন গাজন বা চড়কের যে সকল রীতি পদ্ধতি ও আচারাদি পালন করে থাকে তা আশ্চর্যজন। অনুষ্ঠানের বিস্তৃত পরিচয় লাভের দ্বারা পূর্বকথিত বক্তব্য বিষয়গুলিকে মিলিয়ে দেখব।

গ্রামের নাম : তেঁতুলিয়া (নিকটবর্তী গ্রাম : কৈজুড়ী, স্বরূপনগর, রামচন্দ্রপুর)
থানা / পুলিশস্টেশন : স্বরূপনগর (মছলন্দপুর থেকে ট্রেকার / বাসে ৪০ মিনিট।
নিকটবর্তী স্টেশন : মছলন্দপুর শিয়ালদহ থেকে বনগাঁগামী ট্রেনে ৫০ কিমি)।
ক্ষেত্র সমীক্ষার সময় : (২৮শে চৈত্র - ৩০শে চৈত্র)

প্রথম দিন চড়ক বা গাজনের অনুষ্ঠান উপলক্ষে স্বরূপনগরের পার্শ্ববর্তী গ্রাম তেঁতুলিয়ায় ২৫-৩০ জন ভক্ত জড়ো হয়ে একত্রে গমন করেন মুখুজ্জে ব্রাহ্মণের বাড়ি। সন্ন্যাস গ্রহণে ইচ্ছুক ব্যক্তিবর্গ এই দিন বিকেলবেলা হতেই পরিবার পরিত্যক্ত হয়ে গ্রামে ঘুরে ঘুরে জীবন কাটাবার সংকল্প নেয় মনে মনে। বিকেলের দিকে ভক্তগণ ব্রাহ্মণের বাড়ির পুকুরে স্নান করে উঠে উঠোনের ওপর মাটিতে উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ে। এরপর ব্রাহ্মণ যথারীতি মন্ত্রাদি পাঠ করে শিব হাতে নিয়ে সব ভক্তের পিঠের ওপর পা দিয়ে হেঁটে যায়। ভক্তদের গায়ের ওপর দিয়ে হেঁটে যাবার সময় তাদের মাথা নতুন গামছায় ঢাকা দেওয়া থাকে। এই পর্ব নির্বিঘ্নে কেটে গেলে ধরে নেওয়া হয় সন্ন্যাস গ্রহণে শিবের সম্মতি আছে।

গাজন বা চড়কের অনুষ্ঠানে সন্ন্যাস ধর্ম গ্রহণ করার পূর্বে প্রাথমিক পর্যায়ে যে দৃঢ় সংকল্পের প্রয়োজন তার শক্তিসঞ্চয় করা হয় এই সন্ন্যাস গ্রহণ পর্বে। এই সময় গায়েন

হালকা চালে পয়ারের ভঙ্গিতে 'বালা পাঠ' করেন—

চৈত্র মাস মধু মাস মাসের অবশেষে।
মূল সন্ন্যাসী লয়ে বালা গেলেন শিবের পাশে।।
শিব শিব বলে বালা ডাকিতে লাগিলেন।
আশ্রমেতে সদা শিবের আসন টলিল।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে শিব চারিদিকে চায়।
যত ভক্তবৃন্দ শিব দেখিতে পায়।।
কি কারণে ডাকিতেছ ওহে ভক্তগণ।
গাজন ভিতরে শিব পাবে দরশন।।

গাজনে ভিতরে শিবের দর্শন ও সান্নিধ্য পাওয়া যাবে এ অভয়বাণী শ্রবণ করে সন্ন্যাসীরা আগামী তিনদিনের জন্য কঠিন ব্রতচার পালনের সংকল্পে আস্থাশীল হয়। উত্তর চব্বিশ পরগণার তেঁতুলিয়া গ্রাম এবং অন্যান্য জায়গায় অনুষ্ঠান চৈত্রমাসের শেষে হয় থাকে। পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলাগুলিতে এই অনুষ্ঠানটি চৈত্রমাসে হলেও, কোথাও কোথাও ৫দিন বা সারা মাস ব্যাপীও পালিত হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার সাগরদীঘি থানার অন্তর্গত বেলিরিয়া গ্রামে চৈত্রমাসের ২৪ তারিখ থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত বুড়ো শিবের গাজন অনুষ্ঠিত হয়। বেলডাঙায় হয় ২১শে চৈত্র থেকে সংক্রান্তি পর্যন্ত। নদিয়া জেলার চাপড়ায় চৈত্র সংক্রান্তির পূর্ব থেকে ৭ দিন গাজন সন্ন্যাস হয়। আবার চাকদায় কেউ কেউ সমগ্র চৈত্রমাস অনুষ্ঠান উপলক্ষে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করে। অর্থাৎ বিবেচনা করে দেখলে প্রথমেই একটি বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা মেলে যে পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলায় অনুষ্ঠিত গাজন সন্ন্যাসের সময়সীমা সর্বনিম্ন তিনদিন।

উত্তর চব্বিশ পরগণার গাজন উৎসবের আরও একটি দিক থেকে স্বতন্ত্রতা লক্ষণীয় এবং, তা হল পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য জেলার মত এখানে অত্যধিক বিপজ্জনক খেলা দেখানো হয় না। কাঁটা সন্ন্যাসী প্রথা এখানে প্রায় নেই বললেই চলে, সর্বত্রই খেজুর সন্ন্যাসীর ধর্ম পালন করে ভক্তগণ, আগুন সন্ন্যাসীর সংখ্যাও বর্তমানে ক্রমশ অবলুপ্তির পথে।

প্রথম দিন পুরোহিত ভক্তদের ডাকে শিবকে নিয়ে বাড়ির বাইরে এসে সন্ন্যাসীদের আগে হেঁটে চলে খেজুর গাছের দিকে। নির্দিষ্ট খেজুর গাছতলায় যাবার পূর্বে গ্রামবাসীরা বিভিন্ন পৌরাণিক রূপ গ্রহণ করে সন্ন্যাসীদের পথ অবরোধ করে। কিন্তু বালাকারের পথ কাটানো বালা উচ্চারণের দ্বারা, শিব সাহায্যপুষ্ট সন্ন্যাসীদের বাধামুক্তি ঘটে।

হনুমানের দেহধারণাকারী ব্যক্তি সন্ন্যাস-ব্রতীদের পথ অবরোধ করলে বালাকার পথ কাটানোর বালা পড়ে—

আরে বাছা ভগাপাটা লেজ পড়েছে ঝুলে।
বনের ঘাস খেয়ে তুমি বনে থাকো শুয়ে।।
হাজরা তলায় নিয়ে তোমার ধরব দুটি কান।
শিবের দোরে নিয়ে তোমার দেব বলিদান।।

কালী ঠাকুরের বিরুদ্ধে পথ কাটানোর বালা—

কালীঘাটের কালী মাগো কালী রূপ ধরো।
অসুরেরে বাঁধিয়া তুমি মুণ্ড মালা পরো।।

তাই বলি ওহে কালী দাঁড়িয়ে কেন পথে।
পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াও প্রভু আসছেন রথে।।

সাপরূপ ধারণকারীর বিরুদ্ধে পথ কাটানোর বালা—

স্বর্গ হইতে শিবের রথ নামলো ভূমি তলে।
তেইশ কোটি বেদবান সঙ্গে সদ্দঙ্গে চলে।।
প্রথমে ছাড়িলাম আমি রামচক্র বাণ।
সেই বাণে কাটিলাম আমি সাপেরও পরাণ।।

কংস রূপ ধারণকারীর বিরুদ্ধে পথ কাটানো বালা—

মথুররাজ কংস এবার হও সাবধান।
তোমাকে নাশিবার তরে শ্রীকৃষ্ণের অবধান।।
তাই বলি এবার কংস ছেড়ে দাঁড়াও পথ।
পিছনে তাকিয়ে দেখ আসছে প্রভুর রথ।।

এছাড়া সত্যবান-সাবিত্রী, রাধা-কৃষ্ণ, দুর্গা, ভীম, পুতনা প্রভৃতি বিভিন্ন রূপ ধারণ করে সন্ন্যাসীদের ব্রত সংকল্পে বাধার সৃষ্টি করা হত। তবে এই সমস্ত বাধাকে অতিক্রম করেই শিবের কৃপাধন্য সন্ন্যাসীগণকে খেজুরতলায় গিয়ে জড়ো হতে হয়। খেজুরতলায় গিয়ে পৌঁছাতে পৌঁছাতে সন্ধ্যা প্রায় অতিক্রান্ত হয়ে যায়। এই খেজুরতলাতেই গাজন সন্ন্যাসীদের মূল পরীক্ষা করা হয় এবং তাতে সার্বিকভাবে উত্তীর্ণ হলে পুরোহিত মূল সন্ন্যাসীর হাতে শিব সমর্পণ করেন।

গাজন সন্ন্যাসধর্ম পালনে উৎসাহী প্রার্থীগণ খেঁজুর গাছের নীচে জড়ো হলে তাদের মুখপাত্র হিসাবে নির্বাচিত মূল সন্ন্যাসীকে কাঁটাভর্তি খেঁজুর গাছের ডগায় চড়ে খেজুর ফলগুলিকে মাড়াতে হয়। মূল সন্ন্যাসী যদি এই কাজে অক্ষম হয় তাহলে একজনকে শেষ সন্ন্যাসী নির্বাচন করে তাকে বলা হয় ওই কাজ করতে। দুজনের মধ্যে একজনকে পারতেই হয়, না পারাটা অমঙ্গলসূচক। সেক্ষেত্রে পুরোহিত শিবের মন্ত্রপাঠ করে পুনরায় অভয়বাণী দেন মূল বা শেষ সন্ন্যাসীকে। গাছে উঠে খেঁজুর মাড়ানোর সময় অন্যান্য সব সন্ন্যাসীরা নীচে খেঁজুর গাছের চারপাশে মাটিতে মাথা ঠুকে শিবের কৃপা প্রার্থনা করে থাকে। এই সময় বালাকার খেঁজুর ভাঙার বালা পাঠ করে—

পার্বতী বললেন প্রভু করি নিবেদন।
খেঁজুর সন্ন্যাস করে নর কিসের কারণ।।
খেঁজুর সন্ন্যাস করে যদি কাঁটা ফুটে মরে।
পদ্মহস্ত দিয়ে রাখি কাঁটার উপরে।।
পিতামাতা ছেড়ে নিমাই সন্ন্যাসেতে যায়।
খেজুর সন্ন্যাস করে নর স্বর্গবাসী হয়।।

খেঁজুর ভাঙার পালা সমাপ্তির পর পুরোহিত পার্শ্ববর্তী রায়ের ঘাটে তিন ইঞ্চির ফটিকের শিবের পুজো করেন। ওই পুজোর সময় প্রত্যেক সন্ন্যাসী মঙ্গল কামনা করে শিবের মাথায় ফুল ও বেলপাতা রাখেন। শিবের অনুমতি স্বরূপ ফুল ও বেলপাতা মাটিতে পড়ে যায়। এখানে শিবের ঘাটপুজো হয়ে গেলেই সন্ন্যাসীরা একে একে নতুন গামছা ও কাপড় পরে ঘাটস্নান করে। ঘাটস্নানের সময় অন্তিম পরীক্ষা স্বরূপ সন্ন্যাসীরা জলে বঁটি রেখে তার উপর ঝাঁপ দেয়। বালাকার এই সময় ঘাটবালা পড়ে—

সূর্যবংশের ভগীরথ দিলীপ নন্দন।
ষাট হাজার বছর তপস্যা করে গঙ্গা আনয়ন।।
আগে আগে যায় ভগীরথ শঙ্খ বাজাইয়া।
পশ্চাতে যায় গঙ্গামাতা ভূমিতে গড়ায়া।।
স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে আইলেন ভাগীরথী।
বেগ ধারণ করে যার দেব পশুপতি।।
সোনার খাট সোনার পাট সোনার সিংহাসন।
সেইখানেতে গঙ্গা মাতা করিলেন গমন।।
জল শুদ্ধ স্থল শুদ্ধ শুদ্ধ বেত্রাসন।
শিব শিব বলে সবে জলে নামে ভক্তগণ।।

জলে শুদ্ধ হয়ে সব সন্ন্যাসীকে পুরোহিত উত্তরীয় প্রদান করেন এবং মূল সন্ন্যাসীর হাতে শিবকে সমর্পণ করেন। এই সময় মূল সন্ন্যাসী শিবকে একটা ছোট্ট কলসির মধ্যে রেখে জলে নেন এবং এক ডুবে কলসি ভর্তি জল নিয়ে মন্দিরে ফিরে আসেন। ফিরে আসার পর কলসির জল দেখে অনুমান করা হয় ওই বছর বৃষ্টি কেমন হবে। এই সময় থেকে শিব মূল সন্ন্যাসীর দায়িত্বাধীন হয়ে থাকেন। এই দিনরাতের সময় সব সন্ন্যাসীরা রায়ের বাড়িতে নিমন্ত্রিত হয়ে ফল-মূল ঠাণ্ডা ভাত খেয়ে সাময়িক বিশ্রাম নেয়। তারপর সকলে মিলে হাজরাতলায় যায় ভূতের নিমন্ত্রণ করতে। ভূতপ্রেত শিবের অনুচর বলে শিবের সন্ন্যাসীরা তাদেরও সম্মান প্রদর্শন করে অনুষ্ঠানের সঙ্গী করে নেয়। এছাড়া তিনদিনের অনুষ্ঠান চলাকালীন রাত-বিরেতে যেখানে-সেখানে ঘুরে বেড়াতে গেলে অশরীরী আত্মাদের কু-প্রভাব থেকে মুক্ত হতে হয়। হাজরাতলায় ভূতের নিমন্ত্রণের দ্বারা সেই কার্যই সমাধা হয়। এই সময় সর্বদিকে অশরীরী আত্মার প্রভাব মুক্তির জন্য বালাকার 'চারদুয়ারী বন্ধের' বালা পাঠ করেন। কয়েকজন গাজন সন্ন্যাসী মিলে এই সময় ভূতকে পরদিন খেতে দেবে বলে হাজরাতলাটা পরিষ্কার করে। সব কাজ শেষ হলে সন্ন্যাসী ফিরে আসে এবং মন্দিরে শিব রেখে মন্দিরপ্রাঙ্গণ ঘিরে একজোট হয়ে বিশ্রাম নেয়।

পরের দিন ২৯শে চৈত্র খুব সকালে সন্ন্যাসীরা গ্রামের অন্তর্গত মণ্ডল বাড়ি গিয়ে শিবকে প্রথমে স্নান করায় ডাবের জল দিয়ে। তারপর একে একে সকলে পুকুরে স্নান করে। শিব নিয়ে গ্রামবাসীদের বাড়ি বাড়ি ঘুরে বেড়ায়। সারাদিন ভিক্ষা করে সন্ন্যাস ধর্ম পালন করে। কারও মানত থাকলে তারাও শিবকে স্নান করিয়ে দেয়। এইভাবে দ্বিতীয় দিন সন্ন্যাসীরা সারা পাড়া একত্রিত হয়ে মহানন্দে ঘুরে বেড়ায়। গাজন উপলক্ষে সন্ন্যাসীরা ঘুরে বেড়াবার সময় প্রচণ্ড চৈত্রের গরমে, ধুলোয় কাদায়, অনাহারে, স্বল্পবস্ত্রে প্রায় সঙের আকার ধারণ করে। উত্তরবঙ্গের মালদহ জেলায় এই সময় অনেকে সঙ সেজে বহুরূপীর রূপ ধারণ করে ঘুরে বেড়ায়, গান করে, নৃত্য করে, এই বিশেষ রূপকে গম্ভীরা বলে। গাজনের সঙ্গে এর মিল খুঁজে পাওয়া সম্ভব। যাইহোক সারাদিন ঘুরে বেড়ানোর সময় কিছু সন্ন্যাসী পূর্বদিন নিমন্ত্রিত ভূতদের রন্ধনার্থে শ্মশানের মড়ার কাঠ নিয়ে আসতে যায়। শ্মশানের কাঠ এনে জড়ো করার পর বিকেলে সন্ন্যাসীগণ মণ্ডলদের বাড়িতে এসে বিশ্রাম নেয়। কিছু ফল-মূল-জল-ভাত আহার করে। এই দিন রাত ১১টা নাগাদ নীলপূজা আরম্ভ হয়। এই উপলক্ষে গ্রামবাসী ও সন্ন্যাসী শিবমন্দিরে জড়ো হয়।

পুজো শেষে সব সন্ন্যাসী মিলে ভূতের রান্নার প্রস্তুতি নেয়।

ভূতেদের খাওয়াবার জন্য পরিস্কার আড়াই মুঠো চাল মাটির হাঁড়িতে করে মড়ার কাঠ জ্বালিয়ে সিদ্ধ করে এবং শোল মাছ পুড়িয়ে ভাত ও মাছ নিয়ে রাত ১২টার পর হাজরাতলায় যায় 'হাজরা ভেট' দিতে। সেখানে ভূতেদের খাবার দেবার সময় হাজরা ভেটের মন্ত্রপাঠ করেন বালাকার—

চৈত্র মাসে মধু মাসে হয়ে একমন।
হাজরা তলায় এসেছি ঠাকুর পূজার কারণ।।
সব সন্ন্যাসী উপবাসী তৃণ দণ্ডধারী।
দক্ষিণ হস্তে ভেট নাও অনুরোধ করি।

ভূতদের খাওয়ানোর কাজ ভালোভাবে সমাপ্ত হলে পরে সন্ন্যাসীরা আবার মন্দিরপ্রাঙ্গণে অথবা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে এসে সেই দিনের মতন সাময়িক বিশ্রাম গ্রহণ করে।

তৃতীয় বা শেষ দিন ৩০ শে চৈত্র সন্ন্যাসীদের সর্বাপেক্ষা কঠিন সংযমের দিন। এ দিন সন্ন্যাসীরা একেবারে নির্জলা থাকে, এমনকি থুতু গিলে ফেলাটাও অন্যায় বলে ধরা হয়। এই দিন অর্থাৎ চৈত্র সংক্রান্তির দিন অন্তিম পূজা না হওয়া পর্যন্ত সন্ন্যাসী যে উপোস করে তাকে বলা হয 'কাঠ উপোষ'। এইদিন সকালে উঠে সন্ন্যাসী ব্রাহ্মণের পুকুরে স্নান করে এসে যে কোনো শুকনো পুকুর থেকে মাটি তুলে আনে, প্রথম দিন যে খেঁজুর গাছ মাড়িয়েছিল সেখান থেকে খেঁজুর তুলে আনে। এসব তাদের কাজে লাগে বিভিন্ন জন্তু ও প্রাণীর মূর্তি বানাবার জন্য। সারা দিন ধরে সন্ন্যাসীরা মন্দিরের পাশে মঙ্গলদের উঠোনে বসে বসে পুতুল তৈরি করে, খেঁজুরের বিচি দিয়ে বা কাঁচা খেঁজুর দিয়ে সেই মাটির পুতুলগুলোকে সাজায়। তারপর বিকেলবেলা সেগুলির মধ্যে জল ঢেলে পা দিয়ে চটকিয়ে পুরো উঠোনটাকে কাদা কাদা করে ফেলে। তারপর সেই জলকাদার মধ্যে তারা চাষ করে, ধান বোনে, লাঙল করে একেবারে প্রাক্ সভ্যতা লগ্নের চাষাবাদ পরিকল্পনার চিত্রকে তুলে ধরে। আর এ সব কিছুর পেছনে দেবাদিদেব মহাদেবের কৃপাদৃষ্টি স্মরণ করে গাজন উৎসব জমজমাটি হয়ে ওঠে।

গাজন উপলক্ষে কাদা মেখে আমোদ ক্রিয়া করার লগ্ন শেষ হবার পর সন্ন্যাসীরা পুকুরে স্নান করে এসে শিবের মন্দিরের সামনে জড়ো হয়ে। এখানে পুরোহিত শেষবারের মতো ঘটা করে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে শিবের পূজা করে। গ্রামের সকল লোকের সহায়তায় পূজার আয়োজন ধূপ-ধূনা, ফল-মূল, মিষ্টি-বাতাসা ইত্যাদির সমারোহে পূজামণ্ডপ বেশ আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। পূজোর সময় পুরোহিত মূল সন্ন্যাসী ও শেষ সন্ন্যাসীর নামে, গ্রামবাসীদের নামে এবং গ্রামে যদি বিশেষ কারও কোন অমঙ্গল সূচিত হয়, তার মঙ্গলার্থে শিবের মাথায় ফুল ও বেলপাতা চড়ায়। যদি সেই বেলপাতা নিজে থেকে নিচে পড়ে যায় তাহলে সকলে নির্দিষ্ট ব্যক্তির বা গ্রামবাসীর মঙ্গল সুনিশ্চিত বলে জানবে। অনেক সময় দেবতার আশীর্বাদ না থাকলে ফুল-বেলপাতা পড়তে দেরি হয় বা পড়েই না। একে বলা 'ফুলকাড়ান' অনুষ্ঠান। হাওড়ার ডোমজুর বা হুগলির ত্রিবেণী গ্রামেও এই একই অনুষ্ঠান হয় এই সময়ে, সেটাকে বলে 'ফুলচাপান'। তবে মনে রাখতে হবে যে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় এই ফুলচাপান অনুষ্ঠান হয় দু বার —প্রথম দিন ঘাটে আর শেষ দিন মন্দির প্রাঙ্গণে। উভয় ক্ষেত্রেই ফুল না পড়াটা অমঙ্গলসূচক। আর তা হলে পুরোহিতকে পুনরায় মন্ত্রপাঠ করতে হয় এবং সন্ন্যাসীদের পুনরায় স্নান করে

শুদ্ধ হতে হয়।

ফুলকাড়ান অনুষ্ঠান সমাপ্তির পর দীর্ঘ তিনদিন শিবের কৃপাধন্য সন্ন্যাসীরা নিজেদের সাহসিকতার পরিচয় দিতে বিভিন্ন প্রকার দুরূহ খেলা দেখায়। পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই খেলা দেখানোর পদ্ধতি বিভিন্ন প্রকার। মুর্শিদাবাদ জেলায চড়ক গাছের গাযে দড়ি বেঁধে তার সঙ্গে লোহার আঁকড়ায় পিঠ ফুঁড়িয়ে ঘুরতে দেখা যেত। এখন ভক্তরা মাথায় আগুন নিয়ে ধূপদান উৎসব পালন করে। রত্নবাণ উপলক্ষে গাজন সন্ন্যাসীদের দুই পাশের পাঁজরার মাংস টেনে তাতে লোহার বাণ ফুঁড়ে দেওয়া হয় এবং এই বাণদ্বয়ের অগ্রভাগ একত্রিত করে তাতে ঘৃতসিক্ত তুলা ও কাপড় জড়িয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ওই অবস্থায় সন্ন্যাসীরা মন্দির প্রাঙ্গণে নৃত্য করে। হুগলি জেলার বিভিন্ন প্রান্তে পূর্বে চড়কগাছে পাক খাবার রীতি ছিল। মেদিনীপুর জেলায় বহু স্থানে 'আগুন ঝাঁপ' প্রথা চালু আছে। সেই তুলনায় উত্তর চব্বিশ পরগণার অন্তর্গত তেঁতুলিয়া গ্রামে বিপজ্জনক খেলা দেখানোর ক্ষেত্র সীমিত। এ প্রসঙ্গে 'বঁটিঝাঁপ' খেলাটি বেশ জনপ্রিয়। এ খেলা দেখানোর সময় মন্দির প্রাঙ্গণের সামনে চড়ক গাছের সাথে বাঁশ বেঁধে ১০-১৫ ফুট উঁচু দুটি দাঁড়াবার জায়গা তৈরি হয়, তলায় অন্যান্য লোকের সহযোগিতায় জাল ধরা থাকে। সন্ন্যাসীরা যে যার সাহস মতন ১০ বা ১৫ ফুট ওপর থেকে সেই জালের ওপর ধরা লোহার বঁটিতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ঝাঁপ দেবার আগে ওপর থেকে পাঁচ প্রকার শীষওয়ালা ফল নীচে ফেলে। গ্রামবাসীদের ধারণা এই ফল খেলে রোগ ভাল হয়ে যায়। এই বঁটিতে ঝাঁপ দেওয়া অনুষ্ঠানটি বেশ রোমাঞ্চকর ও জনপ্রিয়। কিছু কিছু সন্ন্যাসী আবার ত্রিশুলের ডগায় আগুন জ্বালিয়ে তাতে ধূপধূনা দিয়ে নৃত্য করে। শেষ দিন সব খেলা দেখানোর পর্যায় শেষ হয়ে যাবার পর সন্ন্যাসীরা তাদের মায়ের বা বাড়ির লোকের হাতে জল প্রসাদ খেয়ে বাড়ি ফিরে আসে। কিন্তু উত্তরীও তখনও খোলা হয় না।

পরদিন সকালে ব্রাহ্মণের বাড়িতে এসে হাতে-পায়ে সর্ষেতেল মেখে ব্রাহ্মণের পুকুরে ডুব দিয়ে আসার পর ব্রাহ্মণ গলা থেকে সুতো খুলে দেয়। ভক্তরা সেই সুতো নিয়ে গিয়ে পুকুরের জলের পাঁকে পুঁতে দিয়ে সন্ন্যাসধর্ম ছিন্ন করে ওপরে উঠে আসে। তারপর থেকে গাজন সন্ন্যাসীরা পুনরায় সাংসারিক জীবনযাপন করে।

এ পর্যন্ত আলোচনায় উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটি নির্দিষ্ট গ্রামের গাজন ও চড়কের অনুষ্ঠান বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হল। কিন্তু পাঠকদের মনে প্রশ্ন উঠতে পারে একটিমাত্র গ্রামের অনুষ্ঠান উপলক্ষে নিবন্ধের নামকরণ 'উত্তর চব্বিশ পরগণার গাজন' কেন বলা হল। এ প্রসঙ্গে কিছুটা স্পষ্ট স্বীকারোক্তি ভূমিকায় করলেও এই অবসরে বলতে হচ্ছে যে গাজন বা চড়কের ধারণায় রীতিগত এবং প্রথাগতভাবে খুব বেশি ফারাক নেই। সর্বত্রই মূল অনুষ্ঠান হয় চৈত্র সংক্রান্তির দিন, সর্বত্রই সন্ন্যাসরা সংসার পরিত্যাগী ফলাহারকারী ছন্নছাড়া শিবের চেলা। সর্বত্রই তারা বিপজ্জনক খেলা প্রদর্শনে উৎসাহী। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, সর্বত্র প্রচলিত রীতিপদ্ধতির মধ্যেও উত্তর চব্বিশ পরগণার তিনটি প্রধান অঞ্চল—বনগাঁ, বারাসাত ও মছলন্দপুরে খেঁজুর সন্ন্যাসীর পরিমানই বেশি। অন্যান্য জেলার তুলনায় এ অঞ্চলে খেঁজুর সন্ন্যাসীর স্বল্প বিপজ্জনক ক্রিয়াকাণ্ডই উত্তর চব্বিশ পরগণার গাজনকে বিশিষ্টতা প্রদান করেছে। সেই সূত্রে প্রায় ২০০ বছরের পুরানো তেঁতুলিয়া গ্রামের গাজন উৎসবটি যথেষ্ট স্বকীয়তার দাবি রাখে।

সুন্দরবনের জনজীবন ও বনবিবি

'বন্যেরা বনে সুন্দর/শিশুরা মাতৃক্রোড়ে'— জনপ্রিয়তার নিরিখে উদ্ধৃতিটির নিগূঢ় সত্য উদ্‌ঘাটনে একমাত্র অনুভবের প্রগাঢ়তা সত্য। মহাজাগতিক নিয়মাবলী অনুসরণ করে গতিশীল পৃথিবীতে নিত্য নতুন প্রাণের জন্ম হয় আবার অবলুপ্তি ঘটে। অসংখ্য নদী-খাঁড়িতে আবদ্ধ আঠারো ভাটির দেশ সুন্দরবনের প্রতিকূল প্রকৃতির সাথে প্রাচীন জনপদের ক্ষণভঙ্গুর আদিম আবাস বাসনা বিশ্ব জীবনের চিরন্তন সত্যের প্রতীক, এই জীবন বহমান, এই জীবন নিষ্ঠুর, এই জীবন পরিশুদ্ধ জীবন চেতনার পরিপন্থী, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন সমাজ সচেতক রচনাকারের হাতে সুন্দরবনের মানুষের সংগ্রামী জীবনের ইতিবৃত্ত উপস্থাপিত হয়েছে, সুন্দরবনাঞ্চলস্থিত বর্তমান সময়ের একজন কথাকারের ভাষায়—

"আপদ বিপদ তুচ্ছ করা কিছু মরিয়া মানুষ
জনহীন জঙ্গলে একদা ঘর বেঁধেছিল
লবণাক্ত জল থেকে ডাঙাকে ছিঁনিয়ে
বাস্তুভিটা শস্যক্ষেত গড়ে তুলেছিল
সহজ সরল আদিম আর অসংস্কৃত ধাঁচে।
বনবিবি গাজীপীর মা মনসা
বিশালাক্ষী টুসু ভাদু
ইত্যাদি দেবী ও দেবকেন্দ্রিক জীবন
ভাগ্য আর নিয়তি নির্ভর,
যার ইতিবৃত্ত আছে ছড়ায় প্রবাদে পাঁচালী প্রার্থনায়—
উপকথা উপাখ্যানে গানে নাচে মূর্তি রচনায়,
সমস্ত অতীত আছে ভীষণ সুন্দর এক মাধুরীর ক্লান্তি নিয়ে
নিয়ে তার শতদল আত্মার সৌরভ
লোকগাথা লোকশিক্ষা লোকসংস্কৃতিতে।"

উল্লেখযোগ্য উদ্ধৃতাংশটির পথম বাক্যবন্ধের শেষে সহজ সরল আদিম আর অসংস্কৃত ধারণা প্রসূত জনজীবনের প্রতিচ্ছবি চিত্রিত হয়েছে। এই আদিম সরলতা জনিত বিশ্বাসের গর্ভেই একদা জন্ম নিয়েছেন মা বনবিবি।

সুন্দরবন প্রসঙ্গে বহু বিচিত্র কাহিনি ও আলোচনার ধারা সেখানকার প্রান্তিক জীবনের বহমানতার সাথেই পুষ্টি লাভ করেছে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার দক্ষিণ পূর্বাংশের নিম্ন ভূমিকে বেষ্টন করে আছে সন্দর বনাঞ্চল। 'সুন্দরবন' এই নামটি পাওয়া যায় ১৮২৮ সালের ৩ নং রেগুলেশন অ্যাক্ট, ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দের পর থেকেই ব্রিটিশ সরকার কৃষিজমির সংস্কার বা সবুজায়নের স্বার্থে বনসম্পদ সংগ্রহের জন্য সুন্দরবনের বনাঞ্চল সংস্কার শুরু করেছিল। ইতিপূর্বে প্রাচীন ঐতিহ্যময় প্রান্তীয়

প্রাকৃতিক অঞ্চল স্বরূপ প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে 'গঙ্গারিডি' রাজ্যের নাম উল্লিখিত হয়েছে। বিখ্যাত প্রাচীন ভূ-বিজ্ঞানী টলেমীর ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে আন্ত গাঙ্গেয় নকশায় পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ গাঙ্গেয় ব-দ্বীপ রূপে সুন্দরবনের নাম উল্লেখ করেছেন। চৈনীক পরিব্রাজক হিউ-এন সাং-এর বিবরণেও সুন্দরবনের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়। চব্বিশ পরগণা জেলায় প্রান্তীয় পাল ও সেন রাজাদের আমলে সুন্দরবনকে প্রাচীন বাংলার একটি সমৃদ্ধশালী জনপদ হিসাবে পরিগণিত করা হয়। বাংলা সাহিত্য সূচনার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদেও নদী মাতৃক প্রান্তিক জনজীবন চিত্রিত হয়েছে। নিম্নবর্গীয় হাড়ি, চণ্ডাল, মুচি, বাগদী ইত্যাদি অশিক্ষিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন ছিন্নমূল অসংখ্য মানুষের আবাসস্থল রূপে নির্বাচিত হয়েছে এই নদী-মোহনার জল-জঙ্গলময় চরা ভুমি অঞ্চল, যাকে আমরা সুন্দরবন বলে জানি। সময়ের প্রাচীন বেষ্টনী ছিন্ন করে বিভিন্ন প্রাকৃতিক ভয়াবহতাকে উপেক্ষা করেও সুন্দরবনের জনজীবন আজ ও বহমান এই সুদীর্ঘ কালব্যাপী জীবন ইতিহাসের কুশীলব মানুষগুলি ত্রি-স্তরীয় অথবা তিনটি পর্যায় ভুক্ত।

ক. প্রথম পর্যায় ঃ দ্রাবিড়, মঙ্গোল, অষ্ট্রালয়েড ও ডেভিড
খ. দ্বিতীয় পর্যায় ঃ নিষাদ, কিরাত ও দামিল
গ. তৃতীয় পর্যায় ঃ পোন্ড্র ক্ষত্রিয়, নামঃশূদ্র, চণ্ডাল, সাঁওতাল, মুন্ডা, তপশিলভুক্ত হিন্দু, মাহিষ্য, মুসলমান।

সুন্দরবনের অতীত ও বর্তমানের পটভূমিতে এই অঞ্চলে বসবাসকারী অধিবাসীদের জীবন ও জীবিকার পর্যালোচনার নিরিখে সর্বত্রই এক প্রবল সংগ্রামের চিত্র উঠে এসেছে, বিশেষ করে পর্যায়ক্রমিক প্রাকৃতিক বিরুদ্ধতায় ফি বছর-জীবনের ভাঙা গড়ার মধ্যে থেকে সুন্দরবনের মানুষ নিজেদের মতন করে গড়ে তুলেছে এখানকার সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি, পূজা পার্বন, উৎসব, উপাচার এবং দেব-দেবী। জনপ্রিয়তার নিরিখে এখানকার সবচেয়ে জনপ্রিয় দেব-দেবীদের মধ্যে অন্যতম বাবা দক্ষিণ রায় এবং বনবিবি।

'বনবিবি'-র সৃষ্টি প্রসঙ্গে 'পশু পূজা'কে অন্যতম বিষয় হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। বনের হিংস্র জন্তু বাঘ, সেই বাঘ পূজা থেকেই পরবর্তীকালে ব্যঘ্রবাহিনী বনবিবির উৎপত্তি অনুমিত হয় আবার বনবিবির নামের মধ্যেই 'বৃক্ষ কেন্দ্রীক' সম্পর্কটি ধরা পড়ে বনাঞ্চলে বৃক্ষ পূজা একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। অরণ্যচারী আদিম মানুষের কাছে বনদেবতার পরিকল্পনা তাদের জীবন ধারার অনিবার্য ফলশ্রুতি হিসাবেই ঘটেছে। সমাজের নীচের তলার মানুষের কাছে বনদূর্গা নামে পরিচিতা বনদেবী কালক্রমে বনবিবি নামে ভূষিতা হয়ে ওঠেন। দেবী দুর্গার মতো মার্জিত রূপের দেখা এখানে পাওয়া যায় না। অমার্জিত আদিম মানুষের আদিম রূপেই ইনি সজ্জিতা। বনদুর্গা বনবিবিতে রূপান্তরিত হয়েছেন মুসলমান আমলে, তৎপূর্বে বনদুর্গার পূজা প্রচলিত ছিল নিম্নবর্গের মধ্যে। এর জন্য কোনো প্রসিদ্ধ মন্ত্র-যন্ত্র ছিল না। ব্রাহ্মণেরা এর পূজা করতেন না। বাদা বনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবি অনেকের মতে বহিরাগত ইসলাম ধর্মের প্রচারক। তার সঙ্গে প্রথমে সংঘর্ষ হয়েছিল দক্ষিণ রায় ও তাঁর মা নারায়ণীর। লৌকিক হিন্দু দেবতা দক্ষিণ রায়ের সাথে সংঘর্ষের পরিশেষে বনবিবির বিজয় সূচিত হয়েছিল পারস্পরিক সন্ধির মধ্যে দিয়ে। অবর্ণ হিন্দু ভক্তের কাছে ইনি সর্বজনপ্রিয় মাতৃমূর্তি। ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ভক্ত জনের

হৃদয় জয়কারী এমন গ্রাম্য দেবী সুন্দরবন অঞ্চলে অদ্বিতীয়। গ্রাম বাংলার সুন্দর বনাঞ্চলের মানুষের কাছে বনবিবি রক্ষাকর্ত্রী, প্রাণ-দায়িনী, মাতৃ স্বরূপা, তাই বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে গড়ে উঠেছে তাঁর থান বা দরগা। অবিভক্ত চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন স্থানের বিভিন্ন ভূ-স্বামীরা এই সব থান বা দরগার জন্যে নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড দান করেছেন, এমন প্রমাণও পাওয়া যায়। ভূমি রাজস্ব বিভাগ থেকে নথিভুক্ত হয়েছে এই প্রকার কিছু স্থানের নাম উল্লেখ করা হল—

ভূরকুণ্ডা, মুক্তারচক্, বেনেপোতা, শুলকুনী, কুবের পাড়া, শালপুড়িয়া, ইছাপুর, বেদেমারী, পাটলীখানপুর, অর্দ্ধের চক, পূবের ঘেরী, পশ্চিম ঘেরী, কুলিয়াডাঙ্গা, মাখাল গাছা, আষাড়িয়া, বজাড়ি, রাজাপুর, ভবানীপুর, খুলনা স্লুইজ গেটের পাশে, হেমনগর, রায়পুর, চাঁপা পুকুর, সারেঙ্গাবাদ প্রভৃতি স্থানে এবং সুন্দরবনাঞ্চলের বাইরে রঘুনাথপুর, দত্তপুকুর, মছলন্দপুর, বনগাঁ, গাজনা প্রভৃতি স্থানে বনবিবির থান বা দরগার নিদর্শন পাওয়া যায়।

এছাড়া অবিভক্ত চব্বিশ পরগণা জেলার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির প্রত্যেকটিতেই এক বা একাধিক স্থানকে বনবিবি তলা নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এমনকি জল নিকাষী খালের নামের সাথ্যে বনবিবি নামের যোগ দেখা যায়। যেমন—

বাসন্তী পঞ্চায়েত সমিতিতে বনবিবি খাল।
গোসাবা পঞ্চায়েত সমিতিতে বনবিবি খাল।

সুন্দর বনাঞ্চলের বনভিত্তিক যে অর্থনীতি গ্রাম বাংলায় বিদ্যমান তার সঙ্গে বনবিবির যোগ ইঙ্গিতবহ, মৌলে, কাঠুরে, সালে ও রাজবংশীদের জীবন এবং এর প্রেক্ষাপটে গড়ে ওঠা গ্রাম বাংলার অর্থনীতির সিংহভাগই বনবিবি নির্ভর হতে দেখা যায় এর মূল কারণ নিহিত আছে সামাজিক শোষণ ও বঞ্চনার মধ্যে। জাতপাত এবং ধনী দরিদ্রের মধ্যে বৈষম্যের চিরন্তন দ্বন্দ্ব থেকেই এই প্রেক্ষাপট রচিত হয়েছে। জীবন এখানে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত। তাই, কোনো মানবশিশু পৃথিবীর বুকে ভূমিষ্ঠ হবার পূর্বে থেকে লোকাচার কেন্দ্রীক মানব বিদ্যাচর্চা শুরু করে আবহমান কালের প্রজ্ঞালব্ধ অভিজ্ঞতাসমূহ থেকে। কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন, জীবনঘাতী পেশায় জলে ও জঙ্গলে গমন, গৃহপালিত জীবজন্তু পালন ও রক্ষণ, সংঘবদ্ধ জীবন যাপন, বৃহত্তর সামাজিক বন্ধন রচনা ইত্যাদি ক্ষেত্রে লোকাচারগুলি এখানকার মানব জীবনের একমাত্র প্রাণস্পন্দন। এই প্রাণের রক্ষক, বরাভয়দাত্রী দেবী বনবিবির গ্রহনযোগ্যতা সুন্দরবনের বিস্তৃত দলিত সমাজের কাছে সবচেয়ে বেশি।

গ্রাম বাংলার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেই প্রাচীন কাল থেকে জাত-পাতের এক কঠিন শৃঙ্খল এখানকার সাধারণ খেটে খাওয়া মানুষদের অবহেলিত ও অবদমিত করে রেখেছিল, বর্ণাশ্রম প্রথার ফলশ্রুতিতে সমাজের নিম্ন বর্ণের মানুষেরা হচ্ছিল নির্যাতিত, শোষিত এবং বঞ্চিত, এমনই এক সময়ে তারা বিশ্বস্ত হয়ে উঠেছিল দৈবী ভাবনায়। সেই দেবী ভাবনায় ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও রাজন্য শক্তির প্রভাব ছিল না। পিছিয়ে পড়া সমাজের অপেক্ষাকৃত অবহেলিত নির্যাতিত মানুষ মুক্তির স্বাদ পেল মিশ্র সংস্কৃতির ধারণার মাধ্যমে, গড়ে উঠল পথে ঘাটে, গ্রামে গ্রামান্তরে মিশ্র সংস্কৃতির মিলন মন্দির এই নিরিখে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে বনবিবির প্রভাব সাম্প্রদায়িক

সম্প্রীতির এক দৃষ্টান্ত বলা যায়। তাই গ্রাম বাংলার সাংস্কৃতিক জগতে বনবিবি এক পৃথক সত্তা নিয়ে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা আমাদেরকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করছে, বনবিবির প্রকৃত প্রয়োজন ও গুরুত্ব কতখানি। সুন্দরবনের পরিবর্তনীয় পরিবেশ ও পরিস্থিতিতে যেমন জাতপাতের ভেদাভেদ মুছে দিতে সক্ষম হয়েছেন, তেমনই তাঁকে কেন্দ্র করেই সৃষ্টি হয়েছে আরো বিশেষ কিছু ঘটনা।

ক. রাজ ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব মুক্ত জনপ্রিয় এক দৈবী শক্তির সূচক।
খ. সাধারণ মানুষের মনের মাধুরী মেশানো মিশ্র সংস্কৃতির স্বাদ।
গ. শ্রেণী বিভেদ বিযুক্ত সংগ্রামী সমাজে নারীর গুরুত্ব স্বীকার

বনবিবিকে কেন্দ্র করে অভিজাত ও অনভিজাত সাহিত্য সম্ভারের মধ্যে একমাত্র দ্বিতীয়টির ক্ষেত্রেই যাবতীয় সৃষ্টি প্রাচুর্য পরিলক্ষিত হয়। বিভিন্ন লোককাহিনি, ছড়া, প্রবাদ, লোকগান ও গীতিকা, লোকনাট্য, লোকশিল্প প্রভৃতিতে বনবিবির অবিস্মরণীয় উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। গ্রাম বাংলায় প্রচলিত কিছু কিছু বনদেবী কেন্দ্রীক সাহিত্য ধারার পরিচয় প্রথমে উল্লেখ করা হল—

বনবিবি মাহাত্ম্যকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলায় দুটি 'জহুরা নামা'র উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রথমটির রচয়িতা মহম্মদ খাতের। খাতের সাহেব হাওড়া জেলার বালিয়া গোবিন্দপুরের বাসিন্দা ছিলেন। তিনি ১২৮৭ সনের ৭ই কার্ত্তিক তারিখে তাঁর আখ্যান কাহিনিটির রচনা করেন দ্বিতীয়টির রচয়িতা চব্বিশ পরগণা ভুরশুট কামপুর নিবাসী মোহম্মদ মুন্সী মহাশয়, তাঁর জহুরা নামা লেখা হয় ১৩০৫ সনের ১২ই ফাল্গুন তারিখে।

বনবিবিকে কেন্দ্র করে গ্রাম বাংলায় অসংখ্য নাটগীতি ও যাত্রাপালা রচিত হয়েছে, সেখানে জহুরা নামায় উল্লিখিত উপকাহিনি অবলম্বনে 'দুখের বনবাস' পালাটি গীতিনাট্য হিসাবে বহুল প্রচলিত ও জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। জনৈক বশিরুদ্দিন গায়েনই বনবিবির যাত্রাপালার প্রথম রচয়িতা। ভুরকুণ্ডা দ্বীপে বসে তিনিই প্রথম এর রচনা, সুর সংযোজনা ও নির্দেশনার ব্যবস্থা করেছিলেন।

বনবিবিকে কেন্দ্র করে গীতিনাট্যের পাশাপাশি সুন্দরবনের বহমান বাস্তব জীবন ধারাকে নিয়ে রচিত হয়েছে গীতি আলেখ্য, বারাসাত মহকুমার ন'পাড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং কর্মসূত্রে সুন্দরবনের বিভিন্ন বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকতার সুবাদে সুন্দরবনকে শ্রী শ্রীপতি ঘোষ মহাশয় তার মনের সুরে বেঁধে গ্রামীন সুরমূর্ছনার সৃষ্টি করেছেন। তাঁর সুন্দরবন মা গো আমার/ আশা ভালোবাসায়' এই গানটি এবং আরো কিছু গানের সুরালাপ করেছেন ভুরকুণ্ডার ভূমিপুত্র শ্রী জগবন্ধু মণ্ডল মহাশয়, সুন্দরবন লোক সংস্কৃতির পরিষদের শিল্পীরা কণ্ঠ মিলিয়েছেন এই গানগুলিতে।

বনবিবি কেন্দ্রীক অসংখ্য প্রবাদ-প্রবচন, ছড়া কিংবদন্তী যাত্রা পালা, যাত্রা দল, মন্ত্র উচ্চারণ প্রভৃতির মধ্যে দিয়ে গ্রামীণ ও নিরক্ষর মানুষেরা নিজস্ব এক সংস্কৃতির জন্ম দিয়েছেন সেই সুবাদে গ্রাম বাংলার সুন্দর বনাঞ্চলে যে সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে তা

জাতপাতের গণ্ডীকে পেরিয়ে নতুন এক বনবিবি কেন্দ্রীক সংস্কৃতির সৃষ্টি করেছে। সেখানে সকলেরই এক পরিচয় বনবিবির সন্তান। একটা সহজ সরল আবেগের সাথে বনবিবির উপস্থিতি সদর্থক ভূমিকা পালন করেছে একথা অনস্বীকার্য।

আমাদের পূর্বে উল্লিখিত বনবিবির গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্যের বিশেষত্ব অনুধাবনের স্বপক্ষে কিছু কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন তুলে ধরা হল। জহুরানামায় বনবিবির জন্ম বৃত্তান্ত ছাড়াও জঙ্গলকাব্যের ধাঁচে একটি উপকাহিনিও রয়েছে—দুঃখে ও বনবিবির উপাখ্যান। দুখে দরিদ্র বিধবার একমাত্র সন্তান, ধনা নামে মৌলে বা মধু ব্যবসায়ী অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে বাদাবনে নৌকার মাঝি হিসাবে নিয়ে গিয়ে দুখেকে বাঘের মুখে ফেলে দিলে মা বনবিবি তাকে উদ্ধার করে দেশে ফিরিয়ে দিলেন। অবশ্য দুখেকে উদ্ধার করবার প্রয়োজনে ব্যাঘ্র দেবতা দক্ষিণরায়ের সাথে বনবিবিকে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। জহুরানামার বিবরণ অনুযায়ী বাদাবনে দক্ষিণরায় শুধু নয় তাঁর মাতা নারায়নীর সাথেও বনবিবির লড়াই, শেষে নারায়ণীর পরাজয় ও বনবিবির সাথে উভয়ের সন্ধি স্থাপনায় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

বশিরুদ্দিন গায়েন প্রণীত গীতিনাট্যের অন্তর্গত গানগুলি যেন সমাজের দর্পণ বিশেষ। শ্বাপদ সঙ্কুল সুন্দরবনে ডাঙায় হিংস্র বাঘ ও নদীতে কুমীরের ভয়। সেই ভয়াল ভয়ংকর স্থানে মৌলে স্বামী জঙ্গলে গেলে তার স্ত্রী গানের মাধ্যমে অন্তরের আশঙ্কা প্রকাশ করেছে—

'কান্ত হে ক্ষান্ত হও ধরি শ্রীচরণে।
বিদায় দিতে তোমায় বলে,
আমার কাঁদে প্রাণ কি কারণে।।
আমার অন্তরেতে অবিশ্রান্ত।
কাঁপিছে দক্ষিণ অঙ্গ,
আজ সুখের রাজি হল ভঙ্গ
অমঙ্গল তত দিনে।।

পৃথিবীতে ভাইয়ের মত আপনার বা আছে। তাই ধনার ভাই মনাও ভাইকে বনে যেতে নিষেধ করে।

মহালেরি কথারে ভাই বলনা মোরে।
শুনেছি সেই গহন বনে,
বাঘ ভালুক রয় সেখানে,
কত মানুষ মারে প্রাণে।
কি জানি কি হয় কপালে।
মোম মধু নাই প্রয়োজন,
কিসের জন্য যাবেরে বন,
তাই তো মারে করি বারণ
ধরি তোমার শ্রীচরণ।।

ধনার মহাল যাত্রায় দাঁড়ি মাঝি জোগাড় হলেও একজন লোকের অভাব ঘটল। ধনা

প্রতিবেশী এক বিধবার একমাত্র সন্তান দুখেকে বলে নিয়ে যেতে চাইলে, সেই বিধবার অবস্থা বিবেকের গানে ধরা পড়ে—

তোমায় করি মানা। দুখিনীর ধন বনে যেওনা।
দুখিনীর ধন গেলে বনে, কেমনে বাঁচিবে প্রাণে,
এ দেহে জীবন রবে না।।
সুমিত্রা কৌশল্যার মত, উহাকে করনা হত,
রাত্র দিবস কেঁদে মরে রাণী খুল্লনা।।
ভাড়া ভানে দুঃখ করে। উহায় দেখলে সর্বসারে,
এখন শ্রীমন্ত হারা হয়ে কাঁদে রাণী খুল্লনা।।
কৃষ্ণ মথুরাতে গেল, ব্রজের দশা কি হইল,
এখন রাত্র দিবস কেঁদে মরল রাণী যশোদা।।

মৃত পুত্রকে বিদায় দিয়েও, তাকে ফিরে পেতে চায় তাই দুখের মা গেয়ে ওঠে—

যায় যায় গো আমার দুখে বনে যায়।
ধরো ধরো দুখেরে মানা কর,
মা বলিতে দুখে বিনা আর কেহ নাই।
.....
.....
একবার ফিরে আয়।।

এমনি মাঝি মাল্লার জীবনের গান, নদী মাতৃক সুন্দরবন ও স্থানের নাম ধরা পড়ে গান গুলিতে, আবার বনবিবির অশেষ করুণা ছায়ায় তাঁর কোলে বসে দুখেকে সান্ত্বনার গান শোনায় এই গীতিনাট্যে বনবিবি।

এই গীতিনাট্য এত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে যে, আজও এই গীতি নাট্য শোনবার জন্য হাজার হাজার মানুষ জড়ো হয়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ এই যাত্রা পালা প্রচারের ব্যবস্থা করেছে গ্রামে গঞ্জে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির দলিল হিসাবে—

গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে ড্যানিয়েল হ্যামিলটন সাহেব সুন্দরবনের গোসবাতে বন কেটে জনবসতি গড়ে তোলার কাজ শুরু করেছিলেন। সেখানে তখন বাঘ, কুমির ও বিষধর সাপেরা সর্বদা মানুষকে মনে করিয়ে দিত তাদের রাজত্বে মানুষের হস্তক্ষেপ তারা মানবে না কিন্তু মানুষের অগ্রাসন ক্ষমতার কাছে বনের পশুরা হার মেনেছিল। উভয়ের বিবাদ, সংঘর্ষ ও দ্বন্দ্বের প্রেক্ষিতকে সামনে রেখে অজস্র প্রবাদ প্রবচনের সৃষ্টি হয়েছে। এই সমস্ত প্রবাদ প্রবচনে বনবিবির সহায়তায় সংকট মুক্তির কামনা করেছেন সাধারণ মানুষ।

মানুষের জীবন বিচিত্র ঘটনা বহুল। এইসব ঘটনার বাস্তবতা আর বিশ্বাসই মানব মনের পাথেয়, তা থেকে জন্ম নেয় এক একটি গল্প, কথা ও কাহিনি। সময়ের সরণী পেরিয়ে কথকের মুখে মুখে প্রচারিত এই সমস্ত কাহিনিকে আমরা বলি কিংবদন্তী, তাই কিংবদন্তী আসলে নিরক্ষর মানুষের উর্বর কল্পনা শক্তির পরিচায়ক এবং একে আদিম গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সাংস্কৃতিক চেতনার অলিখিত দলিল বলা যেতে পারে। সুন্দরবনের

কিংবদন্তীগুলো অধিকাংশ বনবিবি কেন্দ্রীক, সুন্দরবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবী বনবিবির উপর নির্ভর করে এখানকার মানুষের জীবন, জীবিকা আর জীবনধারার চলমানতা রক্ষিত হয়। বনবিবি কেন্দ্রীক কিংবদন্তীর ধারাগুলি চিরস্থায়ী মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়ে আছে সুন্দরবনের মানুষের মনের মণিকোঠায়। এই কিংবদন্তীগুলোর মোটামুটি পর্যায়ক্রমিক বিভাগটি হল এইরকম—

১। বনবিবির অভিশাপে জল নেই ভুরকুণ্ডায়।
২। বনবিবির আশীর্বাদ স্বরূপ বৃষ্টি হয়।
৩। আদি পীঠস্থানে কারোর সর্পাঘাতে মৃত্যু হয় না।
৪। বনবিবির থান সদা জাগ্রত।
৫। বনবিবির অলৌকিক ক্ষমতা সর্বজনবিদিত।
৬। ব্যধি নিরাময়ের দেবী বনবিবি।
৭। দীন দরিদ্রের মনস্কামনা পূরণ করেন বনবিবি।
৮। জলে জঙ্গলে মায়ের মতো পরিত্রাতার ভূমিকায় মা বনবিবি।

বনবিবি কেন্দ্রিক ছড়া ও ঐন্দ্রজালিক ছড়া গুলো সুন্দরবনাঞ্চল ভিত্তিক প্রচলিত প্রচারিত, দেশকালের সীমানা ছাড়িয়ে এর ব্যপ্তি সুদূর প্রসারী হয়ে ওঠেনি। এই ছড়াগুলি বিভিন্ন শিরোনামে ভাগ করা যেতে পারে, ভক্তি ও শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসকে পাথেয় করে বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচারক ছড়া নিম্নরূপ—

১. বিপদে পড়িয়া মা বলি ডাকিবে,
রক্ষা করিবেন মা বিপদ না রহিবে।
২. আধার ভাটির মাঝে আমি সবার মা,
মা বলি ডাকিলে বিপদ রবে না। ইত্যাদি।

বনবিবির মাহাত্ম্য প্রচারক ছড়াগুলির মত তারা ভীত হয়ে পড়ে দক্ষিণরায়ের ভয়ে।

বাদাবনের দক্ষিণ রায়,
কেবলই মানুষ ধরে খায়। ইত্যাদি।

এমনি জীব জন্তুকে নিয়ে এবং নদী নালাকে নিয়েও ছড়ার সন্ধান পেলে।

বনবিবি কেন্দ্রিক ঐন্দ্রজালিক ছড়াগুলি সুন্দরবনের মানুষের কাছে মন্ত্র হিসাবে পরিচিত। শিক্ষায় পিছিয়ে পড়া, কুসংস্কারের বেড়িতে আবদ্ধ দৈবী নির্ভরতার প্রতীক সুন্দরবন বাসীরা এই ঐন্দ্রজালিক ছড়ার উপর আজও নির্ভরশীল। এইরকম ঐন্দ্রজালিক ছড়ার কিছু নিদর্শন ঃ

হিন্দু মন্ত্র ঃ

বনবিবি, ফুল বিবি, দুলা বিবি, মাই বিবি, মতেমা বিবি।
আমার মাল ছাড়া যদি যাও অন্য ঠাঁই।
আর কি জানাই তোমায় ধর্মের দোহাই।
আমার মালে উপরি বন্ধা, ফাঁপরি বন্ধা
ডাকিনী-যোগিনী বাধা, ভূত-প্রেত বন্ধা
দানো দৈত্য বন্ধা।
আমায় যে দেখাবি ভয়

সর্ব্ব অঙ্গ পোড়াব যা এ কয় কথায়। ইত্যাদি।

মুসলমান মন্ত্র ঃ

আলমিন ইলিল্লা হটপুট সা
আল্লার আহত আমি গুনে নিলাম পঞ্চবান।
ওরে অরি দেব দানব নাই ধরে টান
জলবি জলবি বাণ নাজেহাল
আমার এ বান যে দিবি সাঁতার
ধর্মের আহতে তার পুড়ে যা পা
দোহাই নবি জালান
বাঘ ভাল্লুক, হাজারে কুমীর যে যেখানে
থাক না কেন,
দণ্ডের খিলেন তারা না করিও আহার
দোহাই নবির মহম্মদের দোহাই। ইত্যাদি,

সুন্দরবন কেন্দ্রীক গীতি আলেখ্য গুলিতে বনবিবির সন্তানদের সমগ্র জীবন বাস্তবতার প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। পল্লী কবির মেঠো সুরের মায়াজালে ধরা পড়ে এখানকার মানুষের জীবন জীবিকা, অভাব অনটন, কান্না হাসির দিনলিপি। কয়েকটি গানের কথা নিম্নে উল্লেখ করা হল—

১. আকাশ ডাকে ম্যাঘ ডাকে
ডাকে মোরে সাগরে
টানো টানো দাঁড় টানো
এই পোড়া ভাদরে।।
মাছে মাছে জাল ভরে
বনবিবির দয়ারে।।

২. বনবিবির মাঙত মাঙি
আমরা গরীব চাষীরা
ভরাপাণি দেনা মাগো
ধানে থাকুক জীবন ভরা।
হেই মা আমার বনবিবিরে
বলনা বাঁচি কেমনে।।
জীবন ঘিরে আছিস মাতুই

৩. জীবন জুড়ে থাকিস
মাঠ নদী মা আকাশ জুড়ে
মায়ার জাল পাতিস।
চোখের পাণি লোনা যেমা
নদীর পানিও লোনা

বেওয়া নারীর দুঃখে কিতোর
হৃদয় টলেনা?

লোক সাধারণের আকর্ষণ ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে অঞ্চল বিশেষে সুন্দরবনের বনবিবির গ্রহণযোগ্যতা আজও সর্বজনবিদিত। নিয়ত ক্ষণভঙ্গুর বিরুদ্ধ প্রকৃতিমাতার কোলে বসবাসের প্রয়োজনে সুন্দরবনের অধিবাসীবৃন্দ যৌথ সংগ্রামে লিপ্ত, জলে হোক বা ডাঙ্গায়—এই সংগ্রামের ভয়াবহতা সর্বত্রই সুলভ ও প্রসারিত, সমাজের প্রায় অন্তেবাসী এই মানুষগুলোর মধ্যে নারী-পুরুষ ভেদে ভিন্ন ভিন্ন কাজের ধারা বিদ্যমান। পুরুষরা গভীর জঙ্গলে যায় মূলত কাঠ ও মধু সংগ্রহের জন্য অথবা মাছ শিকারের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় গহীন নদীপথে। আর নারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে জঙ্গল থেকে জ্বালানীর কাঠ সংগ্রহ করে। হিংস্র শ্বাপদের হাত থেকে সন্তানকে রক্ষা করে বড় করে তোলে অথবা নদীর জলে নেমে মাছের মীন সংগ্রহ করে। প্রতিকূল আবহাওয়ায় চাষাবাদ যতটুকু হয় তা মূলত ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই সীমাবদ্ধ থাকে, উপরন্তু ফি-বৎসর বন্যার কবলে পড়ে চাষীদের সর্বশান্ত হতে হয়। এখানকার গ্রামীন অর্থনীতি ও পঞ্চায়েত পরিকাঠামো কোনও সাংবিধানিক নিয়মের তোয়াক্কা করে না। বিশেষ করে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা একুশ শতকের আধুনিক ভারতবর্ষের পক্ষে লজ্জার বিষয়। বিজ্ঞানসম্মত স্বাস্থ্য পরিষেবা না পেয়ে এখানকার মানুষ তাদের স্বজন-পরিজনের স্বাস্থ্য সংকটকালে বনবিবির করুণা ভিক্ষা কামনা করে, লৌকিক মানুষগুলির অলৌকিক শক্তির কাছে মনোস্কামনা চাওয়ার বাসনা আধুনিক যুগের কাছে যেমন লজ্জার তেমনি অনগ্রসতারও প্রতীক, তথাপি এই সবকিছুর মধ্যে থেকে মাতৃস্থানীয়া দেবী বনবিবির গ্রহণযোগ্যতা সমাজে নারীশক্তির চিরন্তন জয়ের সূচক।

আধুনিক বিশ্বে জ্ঞানের ভান্ডার আজ পরিপূর্ণ। যদি প্রশ্ন ওঠে—পরিবেশের গতিময়তা না মানুষের জীবন কোনটা চিরন্তন? তাহলে উত্তর অবশ্যই হবে, পরস্পর পরিপূরক। বিজ্ঞান যেমন নিত্যনতুন আবিষ্কার সন্ধানী, মনুষ্য জীবনও ঠিক তাই। একটা সময় ছিল যখন মানুষ জঙ্গলে আর গুহায় বাস করত, তাদের অস্ত্র বস্ত্র সবই ছিল পশুর সমতুল। বর্তমানে মানুষ মহাকাশচারী, সুসভ্য আচার ও সংস্কারের দ্বারা আবদ্ধ। ভারতের পূর্বপ্রান্তে অবস্থিত সুন্দরবনের প্রকৃতি ও মানুষও পরিবর্তনশীল। অনেক কাজ বাকি আছে কিন্তু বিজ্ঞানের ছোঁয়া আজ এখানেও লেগেছে, সব কিছুর সাথে সামঞ্জস্য রেখে অলৌকিক প্রতিভা সম্পন্ন দেবী বনবিবিও পরিবর্তিত হয়েছেন। এই পরিবর্তনের সাক্ষ্য বনবিবি পালার অন্তর্গত দেবীর সজ্জাতে ফুটে ওঠে, বিশেষ করে পোশাক, প্রসাধন, অলংকার সজ্জা, সংলাপের ব্যবহার, বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, মঞ্চসজ্জা, আলোকসজ্জা প্রভৃতি ক্ষেত্রে আধুনিকতাকে অতি সহজেই স্বীকার করে নেওয়ার প্রবনতা বনবিবির গ্রহণযোগ্যতাকে প্রশ্নাতীতভাবে সমৃদ্ধিশালি করেছে, সামগ্রিকভাবে তাই বলা যায়—জাতপাতের সীমাবদ্ধতা ছাড়িয়ে, সমস্ত প্রকার মৌলবাদী (নৈয়চার) কে দূরে সরিয়ে, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে, লিঙ্গবৈষম্যের বিবাদ ঘুচিয়ে, জল-জঙ্গলের দেশে সর্বসাধারণের একমাত্র অভয়দাত্রী ও বিশ্বাসের প্রতীক হয়ে উঠেছেন সুন্দরবনের বনবিবি। আর এখানেই বনবিবির চিরন্তন প্রাসঙ্গিকতা আছে বলে আমাদের মনে হয়।